Downloaded from: justpaste.it/2uei8

Artical-3

(নবীজীর ঝাণ্ডার নিচে ঘোড়সওয়ারেরা)

শায়েখ আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিঃ

প্রকাশনায়ঃ আলফিরদাউস মিডিয়া

প্রথম অধ্যায়

মূর্তির পতন এবং ক্ষমতার পরিবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আন্দোলনের সুচনা

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥)وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)

দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দূর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (সূরা কাসাস ৫-৭)

تعيرني أنا قليل عديدنا كذلك شأن الأكرمين قليل
وما ضرنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل
إذا مات منا سيد قام سيد قأول لأفعال الكرام فعول

অর্থাৎ – সংখ্যায় কম বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছ?
সম্মানিত লোকদের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে।
আমাদের অসুবিধা কম নয় তবে আমাদের বন্ধু সম্মানিত
অথচ অধিকাংশ লোকের আত্মীয়রা অপদস্থ হয়ে থাকে,
আমাদের কোন নেতা মারা গেলে আরেক নেতা দাড়িয়ে যায়।
সম্মানিত ব্যক্তিরা কোন কথা বললে তা কাজে পরিণত করে।

মিসরের সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কিছু পরে। যখন নাসেরি সরকার ১৯৬৫ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের (মুসলিম ব্রাদারহুড) বিরুদ্ধে এক স্মরণীয় আক্রমণের সুচনা করে। প্রায় ১৭০০০ মুসলিমকে এসময় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব এবং তার ঘনিষ্ঠ দুই সহযোগীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আর এসকল জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার ধারণা করেছিল যে তারা মিসরের ইসলামী আন্দোলনকে চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছে। যা আর কোন দিন মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না।
কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাইলেন যে, এই ঘটনাগুলো মিসরে সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি আন্দোলন সুচনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে।
মিসরের ইসলামী আন্দোলন যদিও ইতিপূর্বে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছে, কিন্তু তাদের এটা বিরাট ভুল ছিল যে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়নি। বরং তারা শুধু বহিরাগত শত্রুদের দিকেই তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে। প্রথম থেকেই এ আন্দোলনের আদর্শিক চিন্তাবিদদের এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর যথাসম্ভব চেষ্টা ছিল সরকারের অর্থাৎ বাদশাহর নিকটে ঘেঁষার জন্য। এজন্য তারা তাকে (বাদশাহকে) দেশের আইনানুগ কর্তৃপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।
এসময় বহিরাগত শত্রু ও সংগঠনের মধ্যে অবস্থানরত শত্রুর এজেন্টরা এই সংকটপূর্ণ দলটিকে আরও ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ আন্দোলনের সন্তানেরা তাদের শত্রুর সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেও তারা তাদের পিছন দিকটা তাদের মিত্রের হাতে ছেড়ে দেয়। ফলে সম্মুখের শত্রুর নির্দেশে তাদের মিত্ররা আন্দোলনকারীদের পিছন দিক থেকে ছুরি মারতে থাকে।
জামাল আব্দুন নাসের ও তার সঙ্গিসাথিরা উস্তাদ শহীদ (যেমনটা আমরা ধারণা করি) সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহকে হত্যা করতে চাইল। কেননা উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ ইসলামে তাওহীদ সংরক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার প্রতি বিশেষভাবে জোর দিতেন। মূলত ইসলাম ও তার শত্রুদের মাঝে যে যুদ্ধটি চলমান তা হল আকিদাগত যুদ্ধ, যা তাওহীদকে কেন্দ্র করে চলছে। অথবা যুদ্ধটি শাসন ও শাসনক্ষমতার জন্য পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় ও তার শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য। অথবা দুনিয়াদার ও বস্তুবাদীদের স্বার্থে। কিংবা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম স্থাপনকারির পক্ষে। তাওহিদের ব্যাপারে সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর এই তাকীদ প্রদান, ইসলামী আন্দোলনের মাঝে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। তারা তাদের শত্রুদের সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা লাভ করেছিল এবং তাদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, অভ্যন্তরীণ শত্রু বিদেশীশত্রুর চেয়ে কম ভয়ংকর নয়। বরং এরাই হল বিদেশীশত্রুদের জন্য ভরসা স্বরূপ, এদের দ্বারাই তারা বিরাট উপকার লাভ করে। এরা হল শত্রুদের জন্য এমন ঢাল যার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে তাদের পিছনদিকটা নিরাপদ থাকে।

উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ ও তার জামাত

উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর চারপাশের এই সতর্ক জামাতটি সিদ্ধান্ত নিল যে, দেশের সরকার ব্যবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে যে, এই সরকার ইসলামের শত্রু হয়ে আল্লাহর মানহাজ থেকে বের হয়ে গেছে। এবং তার শরিয়ত অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতে অস্বীকার করেছে।

এই জামাআতের পরিকল্পনা ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। শুধুমাত্র সরকার পরিবর্তনই তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আবার মসনদকে খালি করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং যখন সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর নির্যাতনের নতুন পরিকল্পনা গ্রহন করে, তখনও তাদের উদ্দেশ্য ছিল সতর্কতা অথবা প্রতিরক্ষামুলক অথবা প্রতিশোধমুলক।

কিন্তু এই পরিকল্পনার অর্থ/ উদ্দেশ্য তার বস্তুগত শক্তি অপেক্ষা বড় ছিল। সরকার সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল যে, ইসলামী আন্দোলন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা বিশ্বাস করে যে, সরকার ইসলামের শত্রু। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের ঐ সমস্ত আদর্শ ও নৈতিকতা পরিবর্তনের পর, যা ইতিপুরবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যখন তারা এই ব্যাপারে জোর দিত যে, বিদেশী শত্রুরাই শুধুমাত্র ইসলামের শত্রু। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আন্দলনের কিছু কিছু ব্যাক্তি এখন এই চিন্তাধারাই লালন করে।

যদিও উস্তাদ সায়িদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর এই জামাতের শক্তি শেষ হয়ে গেছে এবং নাসেরি সরকারের হাতে এর কর্মীরা নির্যাতিত হয়েছে। কিন্তু এই সরকার মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে এই মহান জামাতের প্রভাবকে দূর করতে অক্ষম ছিল।

আল্লাহর একনিষ্ঠ তাওহীদ, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহওয়ালাদের মানহাজের প্রতি আনুগত্যের দিকে উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর দাওয়াত ছিল ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আর এর রক্তাক্ত অধ্যায়সমুহ দিনের পর দিন নবায়ন হচ্ছে।

আকিদার প্রতি অবিচলতা, মানহাজের ব্যাপারে স্পষ্টতা, যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃতি উপলব্ধি এবং গন্তব্যের দুর্গমতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের দিক এই বিপ্লব প্রতিদিন শক্তিশালী হচ্ছে। নবি-রাসুল ও তাদের অনুসারীরা যেসমস্ত পথ পাড়ি দেওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে জমিন ও জমিনবাসির উত্তরাধিকার বানিয়েছেন। তাও তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম যুবকদেরকে এই পথের দিকে ফেরানোর ক্ষেত্রে উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর বড় ভুমিকা ছিল। বিশেষভাবে মিসরে, ব্যাপকভাবে গোটা আরব অঞ্চলে। উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের কারণে তার লেখাগুলো যত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, অন্যদের কথা ততটা ছড়ায়নি।

(অনুবাদকের কথাঃ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর শাহাদাতের পর তার কালজয়ী গ্রন্থ তাফসির ফি জিলালিল কুরআনের অনেক কপি মিসরের রাজপথে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রন্থটি এতটা খ্যাতি পেয়েছিল যে, বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এটি এত বেশি ছাপা ও বিক্রি হতো যে, বৈরুতের খ্রিস্টান প্রকাশনাগুলো যদি লোকসানের সম্মুখীন হতো, তখন তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হতো, জিলালিল কুরআন ছাপাও।)

এই লেখাগুলো (যা লেখকের রক্তের দ্বারা লেখা হয়েছে) মুসলিম যুবকদের চোখে দীর্ঘ মর্যাদাপূর্ণ পথের চিহ্নে পরিণত হয়েছে। উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর তাওহীদের দাওয়াতের প্রভাবে নাসেরি সরকার ও তার কমিউনিস্ট বন্ধুদের হম্বিতম্বির পাল্লা কতদূর তা মুসলিম যুবকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক কথাই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার নয়, যে তা অন্তরকে নাড়া দেবে, অন্তরসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে। বরং ঐ সমস্ত কথাই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, যা রক্তের ফোঁটা তৈরি করেছে। কেননা এধরনের কথা থেকেই জীবিত মানুষের অন্তর খোরাক পায়। আর যেসমস্ত কথার উৎস মানুষের মুখ ও জিহ্বা যাকে বিকৃত করে

এবং যার সাথে চিরঞ্জীব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত উৎসের কোন সংযুক্তি থাকেনা, তা তো জন্মলাভই করেছে মৃত অবস্থায়। আর এই সমস্ত কথা মানুষকে সঠিক আদর্শের দিকে এক বিঘত পরিমাণও পরিচালিত করতে পারে না। নিঃসন্দেহে বলা যায়, কেউ এগুলোকে কখনো গ্রহণ করবে না, কেননা তা মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। আর মানুষ মৃত সন্তানকে গ্রহণ করে না।

উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ ছিলেন কথায় সত্যবাদীতার এক নমুনা এবং হকের উপর অটল থাকার আদর্শ। তিনি তাগুতের মুখোমুখি দাড়িয়ে সত্য কথা বলেছেন। এবং জীবন দিয়ে তিনি এর মূল্য পরিশোধ করেছেন। তার কথা গুলো আরও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছে, যখন তিনি জামাল আব্দুল নাসেরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যেতে অস্বীকার করেছেন এবং তিনি তার বিখ্যাত উক্তিটি উচ্চারণ করেছেনঃ যে আঙুলটি প্রত্যেক সলাতে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়, তা জালেমের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনার আবেদনপত্র লিখতে অস্বীকার করে।

নাসেরি সরকার ধারণা করেছিল যে, উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহও তার সাথিদের হত্যা এবং ইসলামী আন্দোলনের হাজার হাজার সন্তানদের গ্রেফতারির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন সাংঘাতিক ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে তারা (ইসলামী আন্দোলন) শান্তভাব প্রকাশ করত এবং গোপনে তারা উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এর চিন্তাধারা ও দাওয়াহ অনুসারে পরস্পরের চেতনাকে জাগিয়ে রাখতো। এবং একই সময়ে ফলের বীজের আকৃতিতে মিসরে জিহাদি আন্দোলনের সুচনা করে। এভাবে এই বীজটি সৃষ্টি হয়েছে, যার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, এই লাইনগুলোর লেখক এবং জিহাদি জামায়াত।

১৯৬৫ সাল ও ১৯৬৭ সালের ঘটনা এবং আনোয়ার সাদাতের ক্ষমতারোহণ

নাসেরি সরকার ১৯৬৫ সালে মিসরি সমাজের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেছিল, যেমন আঘাত কখনো করেনি। এটা ছিল ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নাসেরি সরকারের করা সবচেয়ে ভয়ংকর আঘাত। এই আঘাত মিসরি সমাজের উপর দুটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

প্রথম প্রতিক্রিয়াঃ যারা সরকারের গ্রেফতারীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে এসেছিল, তাদের বর্ণিত ঘটনা ও আকস্মিক হামলা মানুষের ভেতর ভীতি সৃষ্টি করেছিল। তারা আর যে সরকারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধে লিপ্ত হবে, তাদের এই অনুভূতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ল। তারা সরকারের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করল। অবশেষে তারা মিসরি সাধারণ জনগনের মতো আরাম-আয়েশের সামগ্রীর দিকে আবার ফিরে গেল।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াঃ যারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করেছে এবং ক্ষমতার নেশায় যারা হারামকে হালাল করেছে, তাদের প্রতি মনের মধ্যে চেপে রাখা ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল। তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা আগের চেয়ে আরও বহুগুনে বেড়ে গেল। এই অনুভুতি মিসরি দ্বীনদার জনসাধারণকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতি সহানুভূতিশীলে পরিণত করল। বিশেষ করে তারা যখন জানতে পারল, সরকার মুসলমানদের ঘরবাড়ির সম্মান ও মহিলাদের হুরমতের ব্যপারে সীমালঙ্ঘন করেছে।

মুসলিম যুবকদের প্রতি সায়্যিদ কুতুবের পত্রগুলো এই ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে দিল। যে পত্রগুলোর বিষয়বস্তু হল- ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে বিরোধ।

তারপর আসলো ১৯৬৭ সালের সেই লাঞ্ছনাকর পরাজয়। সমস্ত মানুষ দেখতে পেল জালেম সরকারের পদস্খলন ও তার অক্ষমতা। তারা দেখতে পেল কেমন করে মিসরি সেনাবাহিনী মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে

ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজিত অবস্থায় পালিয়ে গেল। ফলে মিসরি জনসাধারণের চোখে সরকার একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। তারা এই অহংকারী সরকারকে উপহাস করতে লাগল। আমার মনে হয় না, মিসরি জনগন আব্দুন নাসের ও তার ১৯৬৭ সালের বিপর্যয় সম্পর্কে যতধরণের হাস্য-কৌতুক তৈরি করেছে, তত কৌতুক অন্য কোন কিছু সম্পর্কে তৈরি করেছে।

১৯৬৭ সালের দুর্ঘটনাটি মিসরে জিহাদি আন্দোলনের চলার পথে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। (এটা হল ১৯৬৭ সালের অধঃপতন। এবং সিনাই প্রান্তরে দিকভ্রান্ত মিসরি বাহিনীর লজ্জাজনক পলায়ন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিসরি বাহিনির সমরাস্ত্রের ধ্বংসসাধন। এবং মিসরি বাহিনীর অধিনায়কদের মদ্যপান ও অশ্লীল ফুর্তির চূড়ান্ত পরিণতি,যারা উম্মাহর দুর্যোগ মোকাবেলায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল।)

এবং সেই মূর্তিটি(জামাল আব্দুন নাসের) ভেঙে পড়ল, যার অনুসারীরা তাকে তৈরি করে জাতির সামনে এমনভাবে উপস্হপন করার চেষ্টা করেছিল জে,সে হলো সেই সিপাহ্সালার খালিদ যে কখনো পরাজিত হয় না।

সরকার অত্যন্ত নগ্নভাবে নিজের অশ্লীলতা, পাপাচার ও অক্ষমতাকে প্রকাশ করলো। মুখে হুমকি প্রদানকারী, ভীতিপ্রদানকারী, প্রতিপক্ষকে পাকড়াওকারি সেই নেতা এমন ব্যরথ মানুষে পরিণত হলো, যে ধাওয়া খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর পর জিহবা বের করে করে শাঁস নিচ্ছে।ভয়ে যার চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে।

জিহাদি আন্দোলন অনুধাবন করতে পারল যে, মূর্তিটিকে এমনভাবে পোকায় খেয়ে ফেলেছে যে, তা একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তারপর তার পায়ের নিচ থেকে জমিন ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল। এবং বেখেয়ালে সে মুখ থুবড়ে জমিনে পড়ে গেল। আর তার পূজারীরা অস্থির হয়ে গেল।

এতে করে জিহাদি আন্দোলনের সংকল্প আরো মজবুত হল।তারা বুঝতে পারল যে, তাদের ঝগরাটে প্রতিপক্ষ মুলতঃ ছিল একটি প্রাণহীন মূর্তি যাকে তৈরি করা হয়েছে মিডিয়া,ধর-পাকড় ও দুর্বল এবং নিরপরাধ লোকদের উপর শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে।

মিসরি সমাজ তাদের হারানো চেতনাকে ফিরে পাবার অবস্থায় উপনীত হলো।সমাজ যথেষ্ট পরিমাণে দ্রুত ইসলামের পথে ফিরে আসতে শুরু করল।এই প্রত্যাবর্তন প্রাথমিক অবস্থায় খুব অল্প পরিমাণ শুরু হয়েছিল।কিন্তু কিছুদিন না যেতেই এই প্রত্যাবর্তনের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে দ্রুত গতিতে বেড়ে চললো।

অতঃপর জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যুতে নাসেরী সরকার প্রচণ্ড আঘাত পেলো। ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের তিন বছর পর সে মারা গিয়েছিল। এই তিন বছরের মধ্যে সবসময় সে সেই পরাজয়ের দুঃসহ স্মৃতি রোমন্থন করত। তার মৃত্যুর সাথে সাথেআরব জাতীয়তাবাদের নেতা ইসরাঈলকে সাগরে নিক্ষেপ করবে এ ধরনের কল্পকাহিনীর অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে গেলো। জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যু একজন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু ছিল না। বরং তা তার আদর্শের মৃত্যু ছিল, যা বাস্তবতার নিরিখে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একটি প্রচলিত কল্পকথার মৃত্যু, যা সিনাই উপত্যকায় ভেঙে গিয়েছিল। এটা ছিল সে সরকার ব্যবস্থার মৃত্যু, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জুলুম-নির্যাতন, তোষামোদি ও খোশামোদির ভিত্তির উপর।

আব্দুন নাসেরের এই বিশাল জানাজা ছিল মিসরীয় জনগণের অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকার সময়ের অবসান, যে অবস্থাটি ছিল শক্তিশালী মিডিয়ার প্রচারণার বিজয়। এবং এভাবেই মিসরীয়রা তাদের নেতাকে শেষবিদায় জানালো। আর এরপর খুব দ্রুতই মিসরীয়রা এই পুরাতন নেতাকে এমন একজন দ্বারা প্রতিস্থাপন করল, যে তাদের কাছে এক নতুন মোহ বাজারজাত করল।

জনগণের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাতপ্রদানকারী এইধরনের প্রচার-প্রচারনা ক্রমেই উন্নয়নশীল ইসলামী আন্দোলনের অবিচলতায় কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারল না। বিশেষভাবে জিহাদি আন্দোলনের উত্থানে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল না।
আর কয়েক বছর পর জামাল আব্দুন নাসেরের নাম সাধারণ মিসরীয়দের মধ্যে শুধু অবজ্ঞা ও উপেক্ষার অনুভূতিই তৈরি করত।
আনোয়ার সাদাতের ক্ষমতারোহণ ছিল মিসরের রাজনীতিকে নতুন ধারায় পরিবর্তন করার সূচনা স্বরূপ। তার ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে রুশদের যুগের সমাপ্তি ঘটল ও আমেরিকার যুগের শুরু হলো।প্রত্যেক পরিবর্তনের মতো এই পরিবর্তনটিও শুরুতে দুর্বল ও নড়বড়ে অবস্থায় ছিল।এরপর যত দিন যেতে লাগলো, তা শক্তিশালী হতে লাগলো।এবং সময়ের সাথে এর উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্ট হতে লাগলো।
আল সাদাত তার পূর্ববর্তী সরকারের অধিনস্ত লোকদের ক্রমান্বয়ে অপসারণ করা শুরু করল। এই লোকদের অপসারণে তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল এটা দেখান যে, সে শুধুমাত্র অবদমিত মানুষের স্বাধীনতার জন্যই কিছু ব্যবস্থা নেয়ার অনুমতি দিচ্ছে।

উস্তাদ সালিহ্ সারিয়াহ্ ও মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ

ইসলামী আন্দোলনের উপর থেকে চাপ সরতে না সরতেই বোতল থেকে দৈত্য (ইসলামী আন্দোলন) বেরিয়ে পড়লো এবং জনগণের উপর ইসলামিস্টদের ব্যাপক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ল। কয়েক বছরের ব্যবধানেই মুসলিম যুবকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের ছাত্র ইউনিয়নগুলোতে ব্যাপক আধিপত্য অর্জন করল। এরপর ইসলামী আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়নগুলোও নিয়ন্ত্রণের দিকে অগ্রসর হল।ইসলামী আন্দোলন সম্প্রসারণের এক নতুন ধারার যাত্রা শুরু হল। কিন্তু এবার আর পূর্বের ভুলের কোন পুনরাবৃত্তি ঘটল না; বরং ইসলামী আন্দোলন পূর্বের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং ঘটনাগুলোর সুবিধা কাজে লাগিয়ে এর উপর নিজেকে গড়ে তুললো।
ইসলামী আন্দোলন তাদের কেন্দ্রসমূহের চিন্তাধারাকে আরো শাণিত করতে শুরু করলো। তার যুবকদের মধ্যে এই সচেতনতার ব্যপক প্রসার ঘটলো যে, ভিতরগত শত্রু বহিঃশত্রুর চেয়ে কম বিপদজনক নয়। এই সচেতনতা মজবুতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল শরীয়তের স্পষ্ট দলীলের উপর নির্ভর করে এবং ইতিহাসের ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি রেখে।
কিছু পুরনো দল চেষ্টা চালিয়েছিল এবং এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পূর্বের ভাঙাচোরা ধ্যানধারণার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যে, জিহাদ শুধুমাত্র বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে করা যাবে এবং ইসলামী আন্দোলন এবং সরকারের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। অধিকন্তু, এই নতুন সচেতনতা ছিল শরয়ী ভিত্তিতে আরো শক্তিশালী এবং বাস্তবিক দিক থেকে পূর্বের মোহ থেকে আরো পরিষ্কার।
এই নতুন সচেতনতার উত্তম ফলাফল যা দাঁড়াল, তা ছিল মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ।
মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ গ্রুপটি মিসরে সালিহ্ সারিয়াহ্র আগমনের পরপরই কাজ শুরু করে। যেখানে সালিহ্ সারিয়াহ্ গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ব্রাদারহুড ব্যাক্তিত্বদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন মিসেস জায়নাব আল গাযালি এবং হাসান আল হুবাইদি। তাদের কাজের উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের একটা দল তৈরি করা, এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে তাদের আহ্বান করা।
সালেহ্ সারিয়াহ্ ছিলেন একজন প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তা এবং খুবই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি কায়রোর আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি শারিয়াহ্ শাস্ত্র খুব ভাল

জানতেন। সালেহ সারিয়াহ এর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাত হয়েছিল কলেজ অব মেডিসিনের ইসলামী সম্মেলনে। তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল বক্তৃতা দেয়ার জন্য। তার বক্তৃতা শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম তার কথার মধ্যে এমন ভার এবং অর্থ রয়েছে যা ইসলামের সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয়। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

আমার শ্রবণযোগ্যতা এই সিংহের কথা শুনে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, তার কথার মাঝে এক অন্যরকম প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া তিনি ইসলামের জন্য ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই সিংহের সাথে আবার সাক্ষাতের চেষ্টা করব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা না থাকায় তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চালানো আমার সকল প্রচেষ্টা বিফল হলো। হয়তো বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তিনি তা (সাক্ষাত) চাননি। তিনিই এর হাকিকত সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। (আল্লাহ তার বিষয়ে/কাজে বিজয়ী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

সারিয়াহ রহিমাহুল্লাহর এই গ্রুপটি সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং তারা বৃহৎসংখ্যক মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ ছাত্রকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন করিম আনাদুলি। তরুণেরা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সারিয়াহর উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তাদের চাপে তিনি সরকার উৎখাতের জন্য একটি চেষ্টা করে দেখতে রাজি হন। তারা একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন, যার মধ্যে ছিল যেসকল পুলিস সদস্য কলেজ গেটে পাহারা দেয় গ্রুপের সদস্যরা নীরবে তাদের নিরস্ত্র করবেন, এরপর তারা কলেজের ভিতরে প্রবেশ করে ভেতরে কিছু নাইট সুপারভাইজারের ছদ্মবেশে থাকা ছাত্রের সাহায্যে অস্ত্র এবং আরমার্ড গাড়িগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নিবেন। তারপর তারা আরব সোশালিস্ট ইউনিয়নের হেডকোয়ার্টারের দিকে মার্চ করবেন এবং সেখানে থাকা আল সাদাত এবং সরকারী কর্মকর্তাদের আক্রমণ করবেন।

এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ এর লক্ষ্যগুলো এবং ঐ লক্ষ্য পূরণে যে প্রস্তুতি দরকার তা সুনির্দিষ্ট ছিল না। গ্রুপের সদস্যরা অপ্রস্তুত অবস্থাতেই গেটে আক্রমণ করে, আর পরিকল্পনার বাকি অংশগুলোও বাস্তবায়নের সময় নানা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়।

কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা আমি এটা দেখাতে চাইছি যে, আব্দুন নাসিরের একের পর এক আঘাতের পরও ইসলামী আন্দোলন প্রমাণ করেছে, নির্মূল করতে চাইলে এটা খুবই বড় আর হতাশা কিংবা পরাজয়ের অনুভূতি তৈরি করতে চাইলে এটা খুবই শক্তিশালী একটা সংগঠন। এই আন্দোলন ১৯৬৭ সালের পরাজয়ের পর একটি নতুন প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে, যারা জিহাদের ময়দানে ফিরে এসেছে। এবং ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, যারা ইসলামের প্রতি খুবই শত্রুপরায়ণ এবং যারা এখনো মার্কিনদের ঘনিষ্ঠ মিত্র।

অবশ্য এই অপারেশনের ঘটনাটি এটাই প্রমাণ করে যে, তরুণ মুজাহিদেরা পুরনো রুশপন্থী নাসেরি যুগ ও নতুন মার্কিনপন্থী সাদাতি যুগের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে নি। যদিও ইসলামের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান।

যদিও এই প্রচেষ্টাটি বিফল হয়েছে। কিন্তু সন্দেহ নেই, তা ইসলামী জিহাদি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন পুঁজি সংযুক্ত করেছে। এই পুঁজি হল- অবিচলতা, প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা এবং পাপাচারী শাসকের সম্মুখ থেকে পলায়ন না করার দৃঢ়তা।

যদিও এই অপারেশন অংকুরেই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এটা ইসলামী আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তনের দিকে নির্দেশ করে। যেখানে ইসলামী আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে

নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমদিকে অর্থাৎ নাসেরি যুগে ইসলামী আন্দোলন শুধুমাত্র তখনকার সরকারের দমন অভিযানের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, এটা দেখাতে যে, নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হবে না। সেসময় ১৯৬৫ সালে আব্দুন নাসিরের লোকেরা ভেবেছিল, একটা বড়সড় অভিযানের মাধ্যমে জিহাদি আন্দোলনকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা যাবে আর সেই অভিযানটাই ছিল সেই স্ফুলিঙ্গ যা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে।
ভীষণ হীন নির্যাতনের পর এই জামায়াতটিকে আদালতে উপস্থিত করা হল। উস্তাদ সালেহ সারিয়াহ, ভাই করিম আনাদুলি ও ভাই তালাল আনসারিকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হল।

উস্তাদ সালিহ সারিয়ার আত্মমর্যাদাবোধ

সরকার এই তিনজনের সাথে আপস করতে চাইল এই ব্যাপারে যে, তারা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে। তালাল আনসারি ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলেন। একারণে সরকারের পক্ষ থেকে তার শাস্তি লঘু করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হল। আর সালেহ সারিয়াহ ও করিম আনাদুলি উভয়ে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করলেন।
একদিন, কিছু রাজনৈতিক বন্দী কারাগারের চত্বরে সালেহ সারিয়াহর পাশে জড়ো হল, তারা তাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আহ্বান করছিল। তখন সালেহ সারিয়াহ তাদের বলেন, আনোয়ার সাদাতের কি ক্ষমতা আছে যে সে আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে? তিনি তাদের আরও বলেন, “এই বিষণ্ন কারাগারের দিকে দেখ, এই নষ্ট খাবার, এই নষ্ট শৌচাগার যেখানে আমরা আমাদের খাবার ফেলে দেই, এটাই হল জীবনের বাস্তবতা। তো কেন এই তুচ্ছ জিনিসকে আঁকড়ে থাকা?”
ফাঁসির পূর্বে শেষবারের মত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উস্তাদ সালেহ সারিয়াহর স্ত্রী কারাগারে এসেছিলেন। তার সাথে তার নয়জন সন্তান ছিল। তখন উস্তাদ সালেহ সারিয়াহ রহিমাহুল্লাহ তাকে (স্ত্রীকে) বলছিলেন – তুমি যদি আমার জন্য ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যাও, তাহলে তুমি তালাক!
আর করিম আনাদুলি কারাগারের মধ্যে ইবাদত, যিকর ও ঈমান মজবুত করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ফাঁসির দিন কারাগারে একজন অফিসার করিম আনাদুলি রহিমাহুল্লাহ এর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল তাকে বেঁধে ফাঁসির কাষ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন তিনি তাদের নিকট দুই রাকাত সুন্নতে শাহাদত সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। (এটা সেই সুন্নত, খুবাইব বিন আদী রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু যার প্রচলন ঘটিয়েছেন) তখন আদেল মুজাহিদ নামক সৈনিকটি; অথচ সে কারাগারের পাপী সৈনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপী, বলল – তুমি ঐ দুই রাকাত সেখানে গিয়ে পড়ো, যেখানে তুমি যাচ্ছো!!
একথা বলার ফলে আদেল মুজাহিদ যেসব সাজার উপযোগী হলো, তার কিছু সাজা কারাগারে দুই সহোদর আদেল ফারেস ও সালাহ ফারেসের হাতে ভোগ করলো। উভয়ে তাকে বেধড়ক মারলো এবং তার এক চোখ নষ্ট করে দিলো। এর ফলে সে কারাগারের চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।
আদেল মুজাহিদ অনেক বড় এক জালেম ছিল। সে কারাবন্দি মুসলিম যুবকদের বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি প্রদান করতো। তার মধ্যে দাম্ভিকতা ও আত্মতৃপ্তি এতো বেড়ে গেল সে একদিন মুসলমানদের নির্যাতন করার পর কোন প্রকার বডিগার্ড ছাড়া কারাগারের সেই কক্ষে ঢুকে পড়লো, সেখানে মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজের মুসলিম যুবকরা বন্দি ছিল। তখন দুই যমজ ভাই মুজাহিদ আদেল ফারেস ও সালাহ ফারেস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে প্রচণ্ড মার দিল অতঃপর তার একটা চোখ বের করে নিল। ফলে সে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

আদেল ফারেস ও সালাহ্ ফারেস মিসর থেকে হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। আদেল ফারেস আফগানিস্থানে গিয়েছিলেন। একপর্যায়ে নাহরাঈন যুদ্ধে উত্তর আফগানিস্থানে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন এবং ইসলামের সমস্ত শহিদদের উপর রহম করুন।

আল জামাআহ্ আল ইসলামিয়্যাহ্ এর প্রতিষ্ঠা

কয়েক বছরের মধ্যে মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজের সংগঠনের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া কিছু কর্মী সংগঠনটিকে আরো দুইবার পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে জামাআতটির গ্রেফতারের ফলে প্রথম প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেলো।তাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি ১৯৭৯ সালে মুজাহিদ যুবকদের গ্রেফতারের পর খতম হয়ে যায়। এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ ছিল সরকারের বেতনভোগী এক গাদ্দার গুপ্তচরের উপস্থিতি।
শহিদ (যেমনটা আমরা ধারণা করি) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ফরজ (কিতাব ফারিদ্বা গইবাহ্ এর লেখক) ছিলেন দ্বিতীয় জামাআতের ঐ সমস্ত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত, যারা গ্রেফতার হয়নি। তিনি কায়রো, গীযা ও উত্তর মিসরে শক্তিশালী আন্দোলনের সূচনা করেন।
ঠিক এই সময় সালাফী জিহাদের স্রোত দক্ষিণ মিসরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসঙ্ঘগুলোর মাঝে প্রভাব বিস্তার করছিল। এবং একই সাথে তারা মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রচেষ্টাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছিল। যারা সরকারের সাথে শান্তি প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।
দক্ষিণ মিসরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই তরুণেরা শায়খ উমার আব্দুল রহমানের ব্যাপারে জানছিল। তারা একসময় তাদের বিভিন্ন লেকচার, কনফারেন্স এবং সম্মেলনে তাকে আমন্ত্রণ জানাতো।
এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণের পর এবার তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করে দিল। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ছিল বিভিন্ন কোলাহলমুখর বিক্ষোভ মিছিল এবং বিভিন্ন সভা যেখানে তারা ইসরায়েলের সাথে শান্তি আলোচনা এবং আল সাদাতের ইরানের শাহকে মিসরে আশ্রয় দেয়ার পদক্ষেপের বিরোধিতা করতো।
মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ফারাজ এবং তার সহযোগীরা দক্ষিন মিসরের এই তরুণদের সাথে যোগ দেন। এই দুই গ্রুপের ঐক্যের ফলশ্রুতিতে উমার আব্দুর রহমানের (যিনি এখন আমেরিকার মিনেসোটার রচেস্টার কারাগারে ১৯৯৩ সালের নিউইয়র্ক বোম্বিংয়ে যুক্ত থাকার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন)* নেতৃত্বে ইসলামিক গ্রুপ (আল জামাআহ্ আল ইসলামিয়্যাহ্) গঠিত হয়।
*কিছুদিন আগে শায়েখ আমেরিকার কারাগারে বন্দি অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন । আল্লাহ্ শায়েখের প্রতি রহম করুন । তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন ।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইয়াহিয়া হাশিমের ঘটনা

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (২৩)

মুমিনদেরমধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণকরেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তনকরেনি।(সূরা আহযাব ২৩)

যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবো না।
আর যদি মারা যাই, তাহলে কবর থেকে বঞ্চিত হবো না।
আমার হিম্মত বাদশাহদের হিম্মত, আমার সত্ত্বা স্বাধীন সত্ত্বা,
যে কুফরীকে সর্বদা অপদস্থ অবস্থায় দেখতে পায়। (ইমাম শাফেয়ী র.)
টেকনিক্যাল মিলিটারি অপারেশনই সেসময়কার একমাত্র অপারেশন ছিল না। এই অপারেশনের বেশ কয়েক মাস পর ইয়াহিয়া হাশিম আল মিনিয়া পর্বতমালায় একটা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা করেন। অবশ্য এই প্রচেষ্টাও সফল হয়নি, কারণ এই ধরণের যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের জন্য যে ধরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়, এখানে তা বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এতে অবশ্য একটা ইঙ্গিত এটাও ছিল যে, ইসলামী আন্দোলনের আদর্শে একটা পরিবর্তন এখন বাস্তব সত্য। আর এ সত্যও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসময়কার মুসলিম তরুণেরা আর মোটেও ১৯৪০ এর দশকের তরুণদের মত নয়।
ইয়াহিয়া হাশিম ছিলেন মিশরে জিহাদের একজন অগ্রদূত। এই খেতাবটা তার নামের সাথে জুড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাকে একটি গর্বিত হৃদয় এবং উচ্চ মনোবল দান করেছিলেন। যা তাকে সাহায্য করেছিল এই মিথ্যা জগতের সবকিছু উপেক্ষা করে, এ সবকিছুকে ত্যাগ করতে। তার আরেকটি ভাল গুণ ছিল, তিনি যা বিশ্বাস করতেন তার প্রতি তার প্রচণ্ড উদ্যম। তার ছিল (আল্লাহ তাকে রহম করুন) এমন একটা বিশুদ্ধ হৃদয় , যা তার মুসলিম ভাইদের জন্য ছিল সহমর্মী।
সেসময় ইয়াহিয়া হাশিম একজন প্রসিকিউটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। যা তরুণদের কাছে ছিল খুবই লোভনীয় একটা পদ। কিন্তু তিনি এই পদ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। আল্লাহর রাহে এই পদ এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সবকিছুই বিসর্জন দিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন।
আমি ইয়াহিয়া হাশিম এবং তার গ্রুপের সাথে প্রথম পরিচিত হই, ১৯৬৭ সালের জুনের পরাজয়ের পর। তিনি আমাদের সাথে যেভাবে যোগদান করেন তা ছিল একটি অনন্য ঘটনা। সেসময় দেশের সর্বত্র বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র এবং শ্রমিকেরা নির্বিচারে বিক্ষোভ করছিল, যারা ইসরাইলী সেনাবাহিনীর সামনে থেকে নাসেরি সরকার এবং তার সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের ভুক্তভোগী ছিল। সেসময়কার সবচেয়ে শক্তিশালী আরব সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছিল, যার নেতা (জামাল আব্দুন নাসের) প্রস্তুতি নিচ্ছিল ইসরাইল এবং তার সমর্থকদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য। এই বিশাল সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট অংশ তখন সিনাই মরুভূমিতে ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) হাত থেকে পালাবার পথ খুজে বেড়াচ্ছিল। আর তাদের বিমানবাহিনীকে তো টেক অফ করার আগে ভুমিতেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

আল হুসেইন মসজিদ থেকে আল জিহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

আমরা ইমাম আল হুসেইনের (আল্লাহ তাকে রহম করুন) মসজিদ থেকে একটা বিক্ষোভ মিছিল বের করে আল-আজহার স্ট্রিট দিয়ে এগিয়ে কায়রোর কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং হুলওয়ান শিল্প এলাকার

শ্রমিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই।
আমরা জুমুয়ার নামাযের জন্য ইমাম আল-হুসাইন মসজিদে গিয়েছিলাম। আমরা মসজিদের বিভিন্ন কোণে নিজেদের ছড়িয়ে দিলাম। নামাজের পর ইয়াহিয়া হাশিম দাড়িয়ে যান এবং লোকদের সম্বোধন করে এই পরাজয়ের ফলে মুসলিম উম্মাহ যেভাবে ভুক্তভোগী হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করেন। আমরা আল্লাহু আকবর ডাকের সাথে তার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলাম। কিন্তু এধরনের ঘটনার জন্য গোয়েন্দারাও প্রস্তুত ছিল। ছদ্মবেশী এজেন্টরা তাকে ঘিরে ফেললো এবং জোর করে তাকে মসজিদের বাহিরে নেয়ার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করল। লোকজন তার এই সাহস দেখে বিস্মিত হয়েছিল, যা তারা আব্দুন নাসিরের আমলে আর দেখেনি। কিন্তু এজেন্টরা তাকে যখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে ধাক্কিয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তখনও ইয়াহিয়া তার জোর কণ্ঠে চিৎকার করে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মসজিদের বাইরের চত্বরে এসেও তার ভাষণ চালিয়ে যেতে থাকেন। তখন ছদ্মবেশী এজেন্টরা তাকে নীরব করার জন্য একটা কৌশলের আশ্রয় নিল। তাদের একজন তার ঘাড় ধরে বলতে থাকল," তুমি চোর, তুমি আমার মানিব্যাগ চুরি করেছ।" ঐ এজেন্ট তখন ইয়াহিয়ার চেয়েও জোরে চিৎকার দিচ্ছিল। এরপর তারা তাকে ঠেলে মসজিদের পাশের একটি ফার্মেসীতে ঢুকিয়ে তা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর একটি গাড়ি এসে তাকে হাসান তালাতের কাছে নিয়ে গেল। হাসান তালাত ছিল সে সময় জেনারেল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর।
নাসেরি সরকার ছিল সেসময় বিভ্রান্ত এবং দুর্বল। তাদের নিরাপত্তা বাহিনী ঐ পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারছিল না। তারা ছিল তখন দুই দাবানলের মাঝখানে- একদিকে ছিল পচা ও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব যারা পরাজয়ের কলঙ্কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অন্যদিকে ছিল একটা জনপ্রতিরোধ যারা ভয়ের বাধন ভেঙে প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিস্মিত করেছিল একটি নতুন এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। জিআইডি ভবনে তারা ইয়াহিয়াকে প্রচন্ডভাবে মেরে তাকে জিআইডি ডিরেক্টর হাসান তালাতের কাছে নিয়ে গেল।
ইয়াহিয়া হাশিম পরবর্তীতে হাসান তালাতের অফিসে হওয়া এই ইন্টারভিউ এবং যে উভয়সংকটে শাসকগোষ্ঠী এসময় পড়েছিল তা সম্পর্কে আমাদের বলেছিলেন। জনগণের ক্ষোভ এসময় বিচারব্যবস্থাতেও পৌঁছে যায়। জিআইডি ডিরেক্টরের সামনে ছিলেন এসময় একজন কর্মরত প্রসিকিউটর (ইয়াহিয়া হাশিম)। যাকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য বিচার করা যাবে না। এসময় সারা দেশ ছিল একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মত, যা জিআইডি ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্বাভাবিক পদ্ধতি, বিশেষত মুসলিমদের উপর যা তিনি অবলম্বন করতেন তা অবলম্বনে বাধা দিচ্ছিল।
হাসান তালাত ইয়াহিয়া হাশিমের সামনে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, বারবার সে নিজেকে একজন সাচ্চা মুসলিম হিসেবে দাবি করতে লাগল, যে ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছে। অথচ তার এই পদোন্নতি ছিল মুসলমানদের রক্ত ও লাশের বিনিময়, যার মাধ্যমে সে শাসকদের সন্তুষ্ট করেছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া হাশিম তাকে সিংহের মতই আক্রমণ করে, তার দাবীগুলোকে খণ্ডন করছিলেন। হাসান তালাতের অফিসের দেয়ালে একটা ফ্রেমে আল্লাহর নাম বাঁধাই করা ছিল। ইয়াহিয়া তাকে বললেন, "কেন তুমি এই ফ্রেমটাকে এখানে রেখেছো যখন তুমি আল্লাহকে জানোই না?"
সরকার এই কঠিন পরিস্থিতিতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল আর তাদের ভাল না লাগলেও কোন শর্তছাড়াই তারা ইয়াহিয়া হাশিমকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল।
সেসময় ইমাম আল হুসেইন মসজিদের এই বিক্ষোভ ছিল আসলে একটা আবেগের বিস্ফোরণের মত। ইয়াহিয়া হাশিম মুসলিমদের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা এবং জিহাদের দিকে তাদের আহ্বান করার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তার এই কার্যক্রম আব্দুন নাসেরের মৃত্যু এবং আল সাদাতের আমলের শুরুর দিকে মুসলিম ব্রাদারহুড সদস্যরা কারাগার থেকে ক্রমান্বয়ে মুক্তি পাওয়ার কারণে কিছু সুবিধা পায়।

ইয়াহিয়া হাশিম বেশ কয়েকজন ব্রাদারহুড নেতার সাথে দেখা করেন। তার বিশুদ্ধ ভাবমূর্তি এবং শক্তিশালী আবেগ থাকার দরুন তিনি এমনভাবে তাদের সাথে আচরণ করেন যেন তারা ইসলামী আন্দোলনের বৈধ নেতা।

তিনি আমাদের কাছে কাজের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেছিলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, নেতৃত্ব হবে তাদের মধ্য থেকে, কিন্তু আমাদের কোন দলের দ্বারা কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তার দায়দায়িত্ব তারা নিবেন না। আমি ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম, "এটা তো একটা সুবিধাবাদী মনোভাব। তারা শুধুমাত্র ভাল জিনিসগুলোই চায়, অথচ খারাপ জিনিস থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকবে!!"

কিন্তু ইয়াহিয়া ব্রাদারহুডের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা এবং বিশ্বাসের কারণে কোন কথাই শুনতে রাজি ছিলেন না। যাইহোক, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আসল সত্য আবিষ্কার করবেন। তার এক ভাই (সাথী) একটি নিরাপত্তা জনিত সমস্যায় জড়িয়ে পড়ল। এজন্যে তাকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইয়াহিয়া ব্রাদারহুডের নেতাদের কাছে গেলেন। কিন্তু তাদের উত্তর তাকে মর্মাহত করল। তারা তাকে বলল তিনি যেন ঐ ভাইকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন এবং তাকে কোন সাহায্য না করেন। এটা ইয়াহিয়া মেনে নিতে পারলেন না এবং তিনি ব্রাদারহুডের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইয়াহিয়া ঐ ভাইয়ের দেখাশোনা ততদিন অব্যাহত রাখেন যতদিন না তাকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

টেকনিক্যাল মিলিটারি কলেজের ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৭৪ সালে। এই বিদ্রোহে ইয়াহিয়া হাশিমের সহানুভূতি ছিল এবং তিনি এর খবরাখবর প্রথম থেকেই অনুসরণ করছিলেন। সেসময়ই তিনি প্রথম সরকারের সঙ্গে একটি সশস্ত্র সংঘাত শুরু করার চিন্তা করেন । তিনি প্রথমে তার ঘনিষ্ঠ লোকদের একটি গেরিলা যুদ্ধ শুরুর আহ্বান করেন। তিনি আমার কাছেও এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু আমি এটা সমর্থন করিনি। আমি তাকে বলেছিলাম এই দেশের ভূখণ্ড এধরণের যুদ্ধের জন্য উপযোগী নয়। আমি গেরিলা যুদ্ধরীতি নিয়ে লেখা একটা বইও তাকে দিয়েছিলাম।

কিন্তু এই চিন্তাধারায় তিনি এবং বেশ কিছু ভাই প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া হাশিম এরপর টেকনিক্যাল মিলিটারি কলেজের ঘটনায় অভিযুক্ত বেশ কিছু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। এরপর তিনি ঐ ভাইরা যাতে পালিয়ে যেতে পারে এজন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। যা তার ডেপুটি প্রসিকিউটর পদকে ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছিল। এই পরিকল্পনায় ছিল মূলত একটি মিথ্যা আদেশ প্রস্তুত করা, যার বিষয়বস্তু ছিল ঐ ভাইদের এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা এবং এই স্থানান্তরের সময় যেন তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু ছদ্মবেশী এজেন্টরা কোর্টরুমে এক অভিযুক্ত ভাইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া একটি চিঠির মাধ্যমে এই পরিকল্পনা জেনে যায়। এই চিঠি ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা জানার পর পরই ইয়াহিয়া হাশিম পালিয়ে যাওয়ার এবং তার ব্যাক্তিগত গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

ইয়াহিয়া হাশিম এবং তার সহযোদ্ধারা পালিয়ে মরুভুমি সংলগ্ন আল-মিনিয়া প্রদেশের একটি পাহাড়ি অঞ্চলে চলে আসেন। তারা কিছু অস্ত্র ক্রয় করেন এবং পাহাড়ের উপর এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন যেন তারা একটা সামরিক ইউনিট। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেয়র তাদেরকে সন্দেহ করে বসে এবং পুলিশকে তাদের সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। পুলিশ এসে তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের অ্যামুনিশন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাদের গ্রেফতার করে। ইয়াহিয়া হাশিম ইউনিট কমান্ডারের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে গেলে সে তার দিকে গুলি ছুড়ে মারে, এতে তিনি নিহত হন। এটাই ছিল ইয়াহিয়া হাশিমের গল্প। যিনি ছিলেন সত্যিকারভাবেই জিহাদের একজন অগ্রপথিক। যিনি তার বিশ্বাসের খাতিরে নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন।